Final as cleared by HCAO, as of 21 September 1650 hrs

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন

ভাষণ

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিউ ইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

Final as cleared by HCAO, as of 21 September 1650 hrs

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

[শুভ সকাল]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রথমেই আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আশ্বস্ত করছি যে, আপনার এ দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করবে।

জাতিসংঘের ম্যান্ডেটকে সমুন্নত রাখা এবং বৈশ্বিক সংকটসমূহ নিরসনে মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের দৃঢ় প্রত্যয় ও সাফল্যমন্ডিত নেতৃত্বের জন্য তাঁকেও জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

'Summit of the Future' আয়োজনে আমি মহাসচিবের দূরদর্শী ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা জানাই।

সম্মেলনে যে 'ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি' (Pact for the Future) এবং 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঘোষণাপত্র' (Declaration on Future Generations) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে তা অ্যাজেন্ডা ২০৩০ পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মপন্থা নির্ধারনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে, এ সম্মেলনের অর্জন বৈশ্বিক সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সবার অভিপ্রায় ও সহযোগিতা কাঠামো প্রণয়নে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

এই জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই আজ আমি বিশ্বসম্প্রদায়ের এ মহান সংসদে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমাদের গণমানুষের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের, অফুরান শক্তি আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল রূপান্তরের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ একনায়কতন্ত্র, নিপীড়ন, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ এবং সামাজিক-যোগাযোগ মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের ছাত্রজনতা তাঁদের অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। তাদের এই সম্মিলিত সংকল্পের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত নিহিত, যা এ দেশটিকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নীত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই গণআন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধা বঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব চেয়েছিল। আমাদের জনগণ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য **আমাদের নতুন প্রজন্ম** জীবন উৎসর্গ করেছিল।

আমাদের এই তরুণরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে তা আমাদের অভিভূত করেছে।

বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেও, বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের এই তরুণরা।

অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিল আমাদের তরুণীরা।

স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসর্গ করেছিল তাঁদের জীবন।

শত শত মানুষ চিরতরে হারিয়েছে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি।

আমাদের মায়েরা, দিনমজুরেরা ও শহরের অগণিত মানুষ তাঁদের সন্তানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছিল রাজপথে।

তপ্ত রোদ, বৃষ্টি, মৃত্যুভয়কে তোয়াক্কা না করে তাঁরা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ব্যাপী রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করার অশুভ ষড়যন্ত্রকে পরাভূত করেছিল।

জনগণের এই আন্দোলনে আমাদের জানা মতে, প্রায় আটশত-এরও বেশি জীবন আমরা হারিয়েছি স্বৈরাচারী শক্তির হাতে।

উদারনীতি, বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর মানুষের গভীর বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭১ সালে যে মূল্যবোধকে বুকে ধারণ করে আমাদের গণমানুষ যুদ্ধ করেছিল, সেই মূল্যবোধকে বহু বছর পরে আমাদের ‘জেনারেশন জি’ (প্রজন্ম জি) নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছে। এরকমটি আমরা দেখেছিলাম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময়েও।

বাংলাদেশের এই ‘মুনসুন অভ্যুত্থান’ আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

আমাদের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমি তাই বিশ্ব সম্প্রদায়কে আমাদের নতুন বাংলাদেশের সাথে নতুনভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

মাননীয় সভাপতি,

যে রাষ্ট্রকাঠামো দুঃসহ হয়ে গেছে, তার পুনর্গঠনের জন্য আমাদের তরুণেরা এবং দেশের আপামর জনসাধারণ একমত হয়ে আমার এবং আমার উপদেষ্টা পরিষদের উপর আস্থা রেখে সরকার পরিচালনার এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা গভীর বিস্ময় ও হতাশার সাথে মুখোমুখিভাবে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, কীভাবে রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মম দলীয়করণের আবর্তে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কীভাবে জনগণের অর্থসম্পদকে নিদারুণভাবে লুটপাট করা হয়েছিল, কীভাবে একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে অন্যায়ভাবে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে দেশের সম্পদ অবাধে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। এককথায়, কীভাবে প্রত্যেকটি পর্যায়ে ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

এরকমই এক অবস্থায় দেশকে পুনর্গঠন এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতীতের ভুলগুলোকে সংশোধন করে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই মুহূর্তে আমাদের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সকল রাজনৈতিক দল এখন স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারছে।

যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত, তাঁদের প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার।

আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষ মুক্তভাবে কথা বলবে, ভয়-ভীতি ছাড়া সমাবেশ করবে, তাঁদের পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে - এটাই আমাদের লক্ষ্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সাইবার ডোমেনসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুসংহতকরণেও আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমাদের একজন কৃষক বা শ্রমিকের সন্তানও যেন সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিশালাকার অবকাঠামো নির্মানের বদলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি।

রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সুশাসন ফিরিয়ে আনাই আমাদের অভীষ্ট।

বাংলাদেশ যে সব আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পক্ষভুক্ত, সেগুলো প্রতিপালনে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘসহ বহুপাক্ষিক বিশ্বকাঠামোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান অব্যাহত থাকবে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী।

মাননীয় সভাপতি,

মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার বাংলাদেশের গণআন্দোলন কালে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন গঠন এবং তার কাজ শুরু করার জন্য দ্রুত বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দায়িত্বভার গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা গুম প্রতিরোধে যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে, তাতে যোগদান করেছি। এর আশু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দেশীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশে বিগত দেড় দশকে যেসকল গুমের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন এ মুহূর্তে কাজ করছে।

মানুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং নির্মম অতীত যেন আর ফিরে না আসে, সেজন্য আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সেই লক্ষ্যে আমরা বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থা, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা,

জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সংস্কারে স্বাধীন কমিশন গঠন করেছি। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সংস্কারের জন্যও পৃথক কমিশনসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কোনো বিদেশি ব্যবসা বা বিনিয়োগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতেও আমরা বদ্ধপরিকর।

এসব সংস্কার যেন টেকসই হয়, তা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতে এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সমতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে আমি বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যাপকতর ও গভীরতর করার আহ্বান জানাই।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশ মনে করে যে, শান্তি রক্ষা এবং সংঘাত মোকাবেলা জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার মূল চালিকাশক্তি। সাম্প্রতিক বিপ্লবকালে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিনতম সময়ে জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীসমূহ আরো একবার শান্তির প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার প্রমাণ করেছে।

এটা সম্ভব হয়েছে শান্তি রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে মানবাধিকারকে স্থান দেয়ার ফলে। জাতিসংঘের শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের (Peace Building Commission) সূচনালগ্ন থেকেই শান্তিরক্ষার মত শান্তি বিনির্মাণেও বাংলাদেশ সমান অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এসেছে। সামনের দিনগুলিতেও আমরা জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে আমাদের মূল্যবোধ ভিত্তিক অবদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা সমুন্নত ও প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর।

জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানকারী চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৪৩টি (তেতাল্লিশ) দেশে ৬৩টি (তেষট্টি) মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছে। বসনিয়া থেকে শুরু করে কঙ্গো পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এ সব মিশনে দায়িত্ব পালনকালে, ১৬৮ (একশ' আটষট্টি) জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা আশা করি, যেকোন অবস্থায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের ভবিষ্যত শান্তিরক্ষী কার্যক্রমগুলোতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা একইভাবে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন।

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের সকলের এই পৃথিবীতে বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সকলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। এই গ্রীষ্মে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গকারী তাপদাহ আমাদের জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমাদের যা প্রয়োজন, তা হলো জলবায়ু সম্পর্কিত ন্যায়বিচার, যাতে করে দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত, উদাসীন আচরণ কিংবা এর মাধ্যমে সাধিত ক্ষতির বিষয়ে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের দায়বদ্ধ করা যায়। জলবায়ু-পরিবর্তনজনিত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলো অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছি, প্যাথোজেনের পরিবর্তনের ফলে নতুন রোগ বাড়ছে, কৃষি ক্ষেত্রে

চাপ বাড়ছে, ক্রমহ্রাসমান পানিসম্পদ ঝুঁকিতে ফেলছে আমাদের বাসযোগ্যতাকে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততা আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে প্রতিনিয়ত। ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধির কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে, তাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ক্ষুদ্র কৃষক এবং প্রান্তিক পর্যায়ে জীবিকা অন্বেষনকারীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। আমি আজ যখন এই বিশ্ব সভায় কথা বলছি, তখন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পঞ্চাশ লাখেরও অধিক মানুষ তাদের জীবদ্দশায় হওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলা করছে।

মহাসচিব গুতেরেস্ আমাদের দেখিয়েছেন যে, বিদ্যমান পরিক্রমা অব্যাহত থাকলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ২.৭ (দুই দশমিক সাত) ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই, বাংলাদেশের মত জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে অভিযোজনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও, উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ ও অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে Loss and Damage Fund - কে কার্যকর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই ভাবে আমাদের প্রয়োজন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। নির্দিষ্ট করে বললে, আমাদের দরকার জীবনরক্ষাকারী প্রযুক্তি, বিশেষতঃ কৃষি, পানি এবং জনস্বাস্থ্য খাতে, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবন এবং সমাধান ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে।

জলবায়ু সংকটের মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি সুসংহতকরণে আমাদের যুগপৎভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব সম্প্রদায় এখন কার্বনমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে মনোযোগী হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে এ ধরণের পরিবর্তনের সুফলভোগী করতে হলে, নেট-জিরো পৃথিবীর লক্ষ্য সমানভাবে পূরণে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে সাথে নিতে হবে। তা না হলে, 'পারস্পরিক দায়িত্ববোধের' মাধ্যমে 'পারস্পরিক সমৃদ্ধি' অর্জনে আমাদের সার্বজনীন অঙ্গীকার পূরণে আমরা পিছিয়ে পড়ব।

এক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি যে, সমগ্র বিশ্ব একসাথে 'তিন-শূন্য'-এর ধারণা বিবেচনা করতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা - শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ অর্জন করতে পারি। যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি তরুণ-তরুণী চাকরি প্রার্থী না হয়ে বরং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। তাঁরা যেন সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজ নিজ সৃজনশীলতার বিকাশ করতে পারে, যেখানে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ সামাজিক সুফল, অর্থনৈতিক মুনাফা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতার মধ্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য আনতে মনোযোগী হতে পারে, যেখানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি ভোগবাদী জীবনধারা থেকে উত্তরণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সৃজনশীল শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এই সময়ে তাই প্রয়োজন উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশসমূহ ও বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন একতা। সামগ্রিকভাবে, এই লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ ব্যবস্থা, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকারসমূহ, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অংশীজন (এনজিওসমূহ) এবং দাতব্য সংস্থাগুলোকে কাজ করতে হবে একসাথে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সামাজিক ব্যবসাকে স্থান দিলেই নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। এই পদক্ষেপ একই সঙ্গে জলবায়ুর ধ্বংসাত্মক গতিকে সফলভাবে রোধ করতে পারে প্রচলিত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই বিষয়ে আমি মহাসচিব গুতেরেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় সভাপতি,

বহুমুখী সংকটে জর্জরিত বর্তমান বিশ্বে, যুদ্ধ এবং সংঘাতের ফলে ব্যাপকভিত্তিতে মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে।

বিশ্ববাসীর উদ্বেগ এবং নিন্দা সত্ত্বেও গাজায় গণহত্যা থামছে না। ফিলিস্তিনের বিদ্যমান বাস্তবতা কেবল আরব কিংবা মুসলমানদের জন্যই উদ্বেগজনক নয়, বরং তা সমগ্র মানবজাতির জন্যই উদ্বেগের। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক ফিলিস্তিনির জীবন অমূল্য। ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়বদ্ধ করতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর চলমান নৃশংসতা, বিশেষত নারী এবং শিশুদের সাথে প্রতিনিয়ত যে নিষ্ঠুরতা বিশ্ব দেখছে, তা থেকে নিস্তারের জন্য বাংলাদেশ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির (immediate and complete ceasefire) আহ্বান জানাচ্ছে। দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানই (Two State Solution) মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি আনতে পারবে, তাই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকলকে এর বাস্তবায়নের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

গত আড়াই বছর ধরে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই যুদ্ধের প্রভাব সর্বব্যাপী। এমনকি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। আমরা তাই উভয়পক্ষকেই সংলাপে বসে বিরোধ নিরসনের মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশ গত সাত বছর যাবৎ মায়ানমার হতে আগত ১২ (বারো) লাখের বেশি রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়ে আসছে। এর ফলে, আমরা বিশাল সামাজিক-অর্থনৈতিক-পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে সৃষ্ট এই সংকট বাংলাদেশ ও আমাদের অঞ্চলের জন্য প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় ধরণের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সহায়তা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালু রাখা এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত সহায়তা অব্যাহত চাই।

রোহিঙ্গাদের সাথে সংঘটিত হওয়া ব্যাপকভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রোহিঙ্গারা যাতে করে নিজ দেশে স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার। এ লক্ষ্যে রোহিঙ্গারা যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাঁদের নিজ ভূমি – রাখাইনে – ফিরে যেতে পারে, তার পথ সুগম করা দরকার। মায়ানমারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একযোগে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করতে প্রস্তুত।

মাননীয় সভাপতি,

রাজনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ ব্যতীত শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

প্রায় এক দশক পূর্বে, বিশ্ব সম্প্রদায় সর্বসম্মতভাবে এজেন্ডা ২০৩০ প্রণয়ন করে। আমরা সবাই আমাদের সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস অর্পণ করেছি এই সার্বজনীন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো (এসডিজি) অর্জনে। তদুপরি, মাত্র পনেরো শতাংশের কম লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে। স্পষ্টতই, এক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র আরো পিছিয়ে আছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এসডিজি অর্থায়নে বছরে প্রায় ২.৫ (আড়াই) থেকে ৪ (চার) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান ঘাটতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণের বোঝা, ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক সক্ষমতা (shrinking fiscal space) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের মত দেশগুলো বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। আমরা আশা করি, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সংক্রান্ত ৪র্থ (চতুর্থ) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ ধরণের জটিল এবং কাঠামোগত সমস্যাগুলোর (complex and systemic challenges) দিকে নজর দেওয়া হবে। বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে সকল রাষ্ট্র সমানভাবে সম্পদ ও সুযোগের ব্যবহার করতে পারে; তাঁরা নিজেদের কর্মসূচীতে সামাজিক ব্যবসাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে পারে; যাতে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর বাস্তবতা বিশেষভাবে মোকাবেলা করা যায়; যা ব্যবসায়ী উদ্যোগ ও ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং যা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

এ ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের প্রবাহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সম্পদের পাচার বন্ধ করা অত্যাবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পাচার হয়ে যাওয়া সম্পদ ফেরত আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। আমরা আশা করি যে, কর ফাঁকি রোধে আন্তর্জাতিক কর কনভেনশন (International Tax Convention) অতিশীঘ্রই গৃহীত হবে।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা যে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বিশ্বে বসবাস করছি, সেখানে অভিবাসন এবং মানুষের অবাধ প্রবাহ এক অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা। বাংলাদেশি নাগরিকেরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এ মুহূর্তে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন।

সকলের জন্য অভিবাসনের উপযোগিতা নিশ্চিত করতে বিশ্বসমাজকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত এবং মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের পথ সুগম করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিবাসীদের মানবাধিকার ও তাঁদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

অভিবাসনের ওপর ২০১৮ সালে যে Global Compact on Migration গৃহীত হয়েছে, তার পূর্ণ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এবং একই সাথে অনিরাপদ অভিবাসন রোধেও আমরা বদ্ধপরিকর।

মাননীয় সভাপতি,

প্রতি বছর প্রায় পঁচিশ লক্ষ তরুণ-তরুণী বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ। এই জনশক্তিকে বর্তমান ও আগামীর জন্য গড়ে তোলা বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

ক্রমপরিবর্তনশীল কর্মজগতে (World of Work) একজন তরুণকে প্রতিনিয়ত নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হয়; এবং কর্মপরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়া শিখতে হয়। এজন্য বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হচ্ছে, তখন আমরা শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা লাভের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় বিকাশ এবং এর বহুমাত্রিক প্রয়োগে বাংলাদেশ বিশেষভাবে আগ্রহী। আমাদের তরুণ সমাজ Generative Artificial Intelligence-এর সম্ভাবনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত। একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে তাঁরাও চায় নতুন পৃথিবীতে নিয়োজিত হতে, কর্মক্ষম হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে। বাংলাদেশের মতো বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগজনিত অর্জিত সুফল থেকে পিছিয়ে না পড়ে, বিশ্ব সম্প্রদায়কে তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, নিশ্চিত করতে হবে যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে কর্মক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা সংকুচিত হয়ে না যায়।

এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করি যে, আমরা Autonomous Intelligence অর্থাৎ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সম্প্রসারিত করতে পারে, মানুষের কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে, তার ব্যাপারে আমরা বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তাঁরা যেন এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আগে মানুষের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে অগ্রসর হন। আমাদের ধারণা Autonomous Intelligence মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের আসলে দরকার নতুন ধরণের সহযোগিতা কাঠামো, যেখানে বৈশ্বিক ব্যবসা ও জ্ঞানের অধিকারী গোষ্ঠী মানুষের চাহিদাগুলোকে যথাযথভাবে অনুধাবন করবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এমন একটি রূপান্তরকারী ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে, যা কর্মসংস্থান, আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতা বা জীবিকার জন্য যুৎসই সমাধান নিশ্চিত করবে।

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের প্রচেষ্টা, সক্ষমতা ও সম্পদ একত্রীকরণের মাধ্যমে সকলের সামর্থ্য, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সমৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহনশীলতা নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছি, সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করতে হবে।

বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর অনন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিভূজীয় সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক দক্ষিণের আওয়াজকে বিশ্বব্যাপী জোরালোভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। সেজন্য, বৈশ্বিক এজেন্ডা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মতামতকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

মাননীয় সভাপতি,

কোভিড অতিমারীর অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (WHO) বৈশ্বিক অতিমারী চুক্তির চলমান আলোচনায় বাংলাদেশ নেতৃত্ব প্রদান করছে। আমরা চাই কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, গবেষণা ও উন্নয়ন, চিকিৎসা পরীক্ষা-ভ্যাক্সিন-থেরাপিউটিক্সের উৎপাদন বহুমুখীকরণে এবং সকল ভ্যাক্সিনকে মেধাসত্ত্ব-অধিকার (Intellectual Property Rights)- মুক্ত ঘোষণা করার ব্যাপারে ঐকমত্য।

অ-সংক্রামক রোগসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাননীয় সভাপতি,

এ বছর আমরা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি।

গত পঞ্চাশ বছর ছিল আমাদের জন্য একটি পারস্পরিক শিক্ষণীয়, সম্মিলিত যাত্রা। সীমিত উপায়ে বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার, সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে আসছে। আমাদের সমন্বিত প্রয়াস সত্যিকার অর্থে একটি নিয়ম-ভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আমি স্মরণ করছি ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ক্ষুদ্রঋণের ওপর গৃহীত রেজুল্যুশনের কথা। সেই সময় জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে Year of Microcredit ঘোষণা করেছিল। যার ফলে ক্ষুদ্রঋণ বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিলো 'Friends of Microcredit'। ২০০১ সাল থেকে সাধারণ পরিষদের 'Culture of Peace' সংক্রান্ত বাৎসরিক যে রেজুল্যুশন গৃহীত হয়ে আসছে বা নিরাপত্তা পরিষদে 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' (WPS) সংক্রান্ত যে ১৩২৫ (তেরশ পঁচিশ) নম্বর রেজুল্যুশন গৃহীত হয়েছিল, তা বাংলাদেশের বিশ্বজনীন উদ্যোগগুলোর প্রতিফলন ও অবদান।

মাননীয় সভাপতি,

আজ, এই মহান বিশ্বসভায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে আজকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে কীভাবে আমরা নারী, পুরুষ, সকলের জন্য আজ ও আগামীর দিনগুলোতে উদ্যোক্তা হবার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারি।

সকল বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সবার হাতে যথেষ্ট সক্ষমতা, সম্পদ এবং উপায় রয়েছে। আসুন, আমরা জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা বাস্তবায়ন করি; এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে সকল প্রকার বৈষম্য ও অসমতার অবসানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

বাংলাদেশের তরুণরা প্রমাণ করেছে যে, মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার অভিপ্রায় কোনো উচ্চাভিলাষ নয়। বরং, এটা সকলের নিশ্চিত প্রাপ্য।

আজ এই মহান সমাবেশে আপনাদের উপস্থিতিতে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ তার ভূমিকাকে ক্রমাগতভাবে জোরদার করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

****